ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ১-১৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4103

উনিশ শতকে গ্রাম বাংলার সমাজ নির্মাণে ধান-চালের ভূমিকা

মোঃ বাবুল সরকার
প্রভাষক, ইতিহাস, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

Abstract: Bengal is a region known for its rich agricultural heritage and cultural diversity. This paper investigates the pivotal role of rice in the social development of nineteenth-century focusing on the cultivation, trade, and socio-economic impact of rice, how this staple crop became a driving force in shaping the economic, social, and cultural dynamics of Bengal during the nineteenth century. The socio-economic implications of rice cultivation are explored in relation to labor dynamics, landownership patterns, and class structures as well in education. The labor-intensive nature of rice farming led to the emergence of distinct social classes based on roles in the production process. This research investigates the impact of these social structures on community organization, highlighting the intricate relationships between rice cultivation and the formation of social hierarchies. Culturally, rice assumed a central role in Bengal's identity, influencing culinary practices, religious rituals, and social traditions. The study delves into the symbolic significance of rice in shaping cultural narratives, fostering a sense of shared heritage. This analysis contributes to a comprehensive understanding of the crucial role played by rice in the social building of nineteenth century Bengal.

Key Words: Nineteenth-Century Bengal, Rice, Rice Cultivation, Agrarian Landscape, Society, Rural Bengal

ভূমিকা: আঠারো শতকে বাংলায় ব্রিটিশদের শাসনতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হলেও সে পরিবর্তন আবহমান বাংলার জীবনযাপনে কোনো মৌলিক তারতম্য ঘটাতে পারেনি। বিনয় ঘোষ উনিশ শতকের স্থবির গ্রাম্য সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে, "পরিবর্তনের স্রোত যত দ্রুত নাগরিক সমাজে প্রবাহিত হয়, গ্রাম্য সমাজে তা হয় না। নাগরিক সমাজ গতিশীল জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে, দ্বন্দ্ববিরোধের শব্দ-প্রতিশব্দে মুখর, কিন্তু গ্রাম্য সমাজ রাত্রির মতো স্থির শান্ত ও অচঞ্চল। ভারতের ও বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজের এই শান্তস্থির অচঞ্চলতা শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্ষুণ্ন ছিল।"[১] উনিশ শতকেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। অতীতের মতোই এই শতকেও গ্রামীণ বাংলায় ধান-চাল অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে। বাঙালির প্রধান খাদ্য উপাদান হিসেবে ভাত

অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবেই প্রথম। এছাড়া পূজা-পার্বনসহ বিভিন্ন উৎসবে-আমেজে ধান-চালের ব্যবহার আছে এবং বিনিময় মূল্য হিসেবে নগদ অর্থের মতোই পারিশ্রমিক হিসেবে ধান-চালের ব্যবহার বহু পুরনো। ধান চাল থেকে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে বাসি ভাত, তুষ, খড় খেয়ে এ অঞ্চলের গবাদি পশুও বেঁচে থাকে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার ধানী জমির মাত্র ৬% জমিতে উন্নত বীজ বপন করা হতো।[২] ১৮৮৫ সালে বাংলায় প্রাদেশিক কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষির যথাযথ কোন উন্নয়ন ঘটেনি। কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির ক্ষেত্রেও প্রাচীনত্ব থেকে যায় বিশ শতক পর্যন্ত।[৩] বাংলার কৃষি ব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় ফসলহানির ঘটনাও প্রতিনিয়ত বিস্তর ঘটেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এখানে বন্যা ও খরা কৃষকের নিত্য সঙ্গী। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কিছু মানবসৃষ্ট উপাদান যেমন ব্রিটিশদের রেলপথ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ফসলের ক্ষতি; পশু খাদ্যের অভাব এবং রোগাক্রান্ত হয়ে কৃষকের হালের বলদের মৃত্যু, মহাজনি ব্যবস্থা, দাদনের প্রভাবে কৃষকের হাতে মোটেই ধান-চাল থাকত না।

বাংলার গ্রাম উন্নয়ন, গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি প্রযুক্তি এবং সমাজ কাঠামো নিয়ে বিশদ গবেষণা হলেও গ্রামীণ সমাজ নির্মাণে ধান চালের ভূমিকা নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। বর্তমান প্রবন্ধে লেখকের গ্রামীণ জীবনে বসবাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গ্রামের সমাজ কাঠামো এবং ধান-চাল কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাংলায় ধান চাষের ইতিহাস: বুনো শস্যদানা থেকে কীভাবে ও কবে ধান আবাদি শস্যে পরিণত হলো তা নিয়ে ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিতর্ক আছে।[৪] প্রত্ন-উদ্ভিদ বিশারদ মিজানুর রহমানের মতে, মধ্য এবং নিম্ন গঙ্গায় বুনো ধানের বদলে পোষাধানের চাষাবাদ শুরু হয়েছিল দুই হাজার বছর খ্রিস্টপূর্ব থেকে পাঁচশত খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে।[৫] বিতর্ক আছে ধানের উৎপত্তিস্থল নিয়েও। প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল বলছেন যে, ইয়াংসি নদী তীরবর্তী ধানের সাথে গঙ্গা নদী তীরে ধান চাষের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এদিকে ভারতবর্ষে ধানের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় *যজুর্বেদে*।[৬] এরপর থেকে ধান-চালের উল্লেখ সংস্কৃত ভাষার ধর্মীয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়।

কবে থেকে ধান চাষ আরম্ভ হয়েছে সে বিষয়ে নানা মতামত পাওয়া যায়। এটা স্পষ্ট যে, ধানচাষ যে সব অঞ্চলে প্রথমদিকে শুরু হয়েছে তার মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারতের উড়িষ্যায়ও বাংলার মতো এক শ্রেণির মানুষ ধান চাষ না করে ধান সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। একুশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর বাংলার সাঁওতাল,

ওঁরাওসহ অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ ইঁদুরে খাওয়া ধান সংগ্রহ করে তাদের ভাতের চাহিদা নিবারণ করত বর্তমান লেখক যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ধান সংগ্রহের পাশাপাশি প্রাচীনকালে উপর গঙ্গা ও মধ্য অববাহিকার জলাভূমিগুলোতে ধান চাষ হয়ে থাকে।[৭]

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ২১০০-১৪০০ খ্রি.পূর্বাব্দে ধানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে অন্যান্য জায়গাতেও ধানের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষদলে প্রাপ্ত ধানের চারকোলের রেডিও কার্বন করে দেখা গেছে এটা ১৩৮০ থেকে ৮৫৫ খ্রিস্টপূর্বের।[৮]

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> প্রথমেই প্রধান শস্য ধানের সহিত আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়, আগেই বলিয়াছি, আমরা পাই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ, প্রাচীন করতোয়া তীরবর্তী মহাস্থানের শিলালিপিখণ্ডটি হইতে।...রাজকীয় শস্যভান্ডার হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে ধান্য দেওয়া হইয়াছিল-- খাইয়া বাঁচিবার জন্য, না বীজ হিসাবে, তাহা উল্লেখ নাই, কিন্তু ধান্য বিতরণ ঋণ হিসাবে।[৯]

ধান চাষাবাদ না হলে তো আর ধান বিতরণ সম্ভব নয়। এই অনুমান সত্য নাও হতে পারে অন্য অঞ্চল থেকে ধান আমদানি করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবনা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা যে দেশের 'প্রধান উপজীব্য ধান'[১০] সেখানে কখনই পুরোপুরি আমদানি নির্ভর হতে পারে না।

চাষাবাদ পদ্ধতি: ধান অনেক উঁচুতে যেমন চাষ করা যায় তেমনি নিচু জমিতে যেখানে পানি জমি থাকে সেখানেও চাষ করা সম্ভব। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার কৃষি ছিল প্রাকৃতিক সেচ নির্ভর। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়: "অগণিত নদনদী-খালবিল থাকা সত্ত্বেও এ দেশের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে নানা লোকায়ত ব্রত ও পূজানুষ্ঠানে মেঘ ও আকাশের কাছে বারি প্রার্থনার বিরাম নাই; অতীতে ছিল না, আজও নাই।" ধানের বীজ বপন থেকে ধান কাটা পর্যন্ত প্রকৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করা ছাড়া কৃষকের আর কোনো উপায় ছিল না।

উনিশ শতকে ঢাকা জেলাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধান-চাষ সংক্রান্ত একটি বিবরণ পাওয়া যায় জেমস টেলর-এর *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca* বইয়ে। জেমস টেলর উল্লেখ করেছেন- নদী-নালা ও জলাভূমির প্রান্তভাগে যেখানে সেচের জন্য সহজে পানি পাওয়া যায় এমন জায়গাই মূলত ধান চাষের জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকত। আমন ধানের জন্য জমি লাঙ্গল অথবা পা দিয়ে মাড়িয়ে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যেন তা ২.৫ ফুট গভীর কাদা হয়। বীজ ধান ঝুড়িতে ভরে ডোবা পুকুরে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পর তা দুই দিন রোদে শুকিয়ে তাতে পানি ছিটানো হতো এবং ৫ দিন পর ধান থেকে অঙ্কুর বের হতো। বীজতলা মৈ দিয়ে মসৃণ করে তাতে বীজ বপন করা হতো।[১১]

অঞ্চল ভেদে এই ধানের চাষাবাদের কিছুটা ভিন্নতা ছিল। উনিশ শতকে বাংলা প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কীভাবে ধান চাষ হতো তার বিবরণ পাওয়া যায় হ্যামিল্টন বুকাননের বিবরণে। বাংলায় ধান চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া পদ্ধতি শত শত বছর ধরে প্রায় অপরিবর্তনীয়ই ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্যে এর সমর্থন পাওয়া যায়: "বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের লোকেরা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করিত এবং গ্রামের চতুর্ষ্পার্শ্বস্থ জমি চাষ করিয়া নানা শষ্য ও ফলাদি উৎপাদন করিত। এখনকার ন্যায় তখনো ধান্যই প্রধান শস্য ছিল এবং ইহার চাষের প্রণালীও বর্তমানকালের ন্যায়ই ছিল।"[১২] ব্রিটিশরা ধান উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েছে। তবে জমির গুণগত মান বা চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নয় বরং অনাবাদি জমি, পতিত জমি, জঙ্গল পরিষ্কার করে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ধান উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

গরু-মহিষের হাল, মানুষে টানা হাল কিংবা পা দিয়ে কাদা মাড়িয়ে কতটুকু জমি চাষাবাদ করা সম্ভব সেটা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। আরেকটি বিষয় হলো- মানুষ সচরাচর বাড়ি থেকে দূরবর্তী জমি চাষাবাদ করতে আগ্রহী ছিল না। কারণ বহুকষ্টের ধান পাখি এবং বন্য পশু যেমন শুকুর, হাতি নষ্ট করে ফেলত। কখনো কখনো অসাধু লোকেরা ফসল কেটে নিয়ে যেত অথবা ধান ক্ষেতে আগুন দিয়ে দিত। ফলে ব্যাপক ফসল হানি হতো। আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে, হালের বলদ বা গরু কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে একজন কৃষকের পক্ষে সহজে আর গরু কেনা সম্ভব ছিল না। এর ফলেও অনেক সময় আবাদী জমির অনেকখানি অনাবাদী পরে থাকত।

উনিশ শতকের সমাজ কাঠামো: ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর উনিশ শতকে ভূমিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসটি হলো: জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার, পত্তনিদার, জোতদার, রায়ত, বর্গাদার, আধিয়ার ও ভূমিহীন কৃষক ও কৃষি মজুর ইত্যাদি। এছাড়া সমাজে ছিল বেনিয়া, দালাল, মুৎসুদ্দি, ফড়িয়া ব্যবসায়ী, ইজারাদার, শিক্ষক, কবিরাজ, লাঠিয়াল, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, মহিলা শ্রমিক, মজুর, মাঝি, নাপিত, সহিস ইত্যাদি শ্রেণি-পেশার মানুষ। সামন্তবাদী এই সমাজের চূড়ায় অবস্থান করছেন জমিদার ও জোতদার শ্রেণি। গ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করত জমিদার। জমিদারদের বেশির ভাগই থাকতেন কোলকাতায় এবং তাদের অধীন জোতদার বা নিযুক্ত কর্মচারীই গ্রামীণ সমাজে ছড়ি ঘুরাত। জমিদার শ্রেণি এই শতকের দ্বিতীয় দশকে নিজেদের আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তারা যখন তখন ইচ্ছেমতো প্রজাদের নানারকম কর চাপিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতেন। প্রজাকূল যথাসম্ভব তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া কর এবং অন্যায় অত্যাচার মেনে নিয়েছিল। একসময় তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে তারা বিদ্রোহ করে বসেছে। এজন্য আমরা বাংলার ইতিহাসে পুরো উনিশ শতক জুড়েই অনেকগুলো কৃষক বিদ্রোহ দেখতে পাই।

উনিশ শতক জুড়ে বাংলায় যে নবজাগরণ হয়েছে তা গ্রামীণ জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে অমিতাভ বলেন, "উনিশ শতকের বাংলা সম্পদে, প্রাচুর্যে এবং প্রদীপ্ত এক নবীন জীবনের সন্ধান পেলেও তার স্বাদ গ্রহণে দেশের জনসাধারণের অতি সীমিত অংশের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল এবং ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী (মূলত হিন্দু) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রধানত: এই নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল।"[১৩]

বাংলার গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে মানুষের মধ্যে তখনও জাতিভেদ প্রথা প্রকট আকারে বিদ্যমান ছিল। ইংরেজি পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষার প্রভাবে বাঙালির মানস পটে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো- গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, পুরীর জগন্নাথের রথের মেলায় আত্মবলিদান, কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত কবর দান, চড়ক পূজায় শরীরের নানা অংশ বাণবিদ্ধ করে অকালমৃত্যু বরণ, নমর্দার কাছে মহাদেও পর্বতের শিখর হতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুকে আহ্বান, উড়িষ্যার খোন্দ জাতির মধ্যে শিশুকন্যা হত্যার প্রথা এবং শাস্ত্রীয় নরবলি ইত্যাদি।[১৪]

উনিশ শতকে উৎপাদিত ধান-চালের পরিমাণ: বাংলায় আউশ, আমন, ভাদই ও বোরো ধানের অনেক প্রকরণ বছরের বিভিন্ন সময় উৎপাদিত হতো। যেমন বাকেরগঞ্জে (বরিশাল) বালাম ধানের চাষ হতো এটা মোটা আর সাধারণ মানের; দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে চাষ হতো মিহি চালের ধান। কাঞ্চনপুর ও বর্ধমানে চাষ হতো নোনা, বাঙোটা, কালিয়া, বেনাফুলি, রামশালি, সূর্যমুখী, দাদখানি, আলম-বাদশাহী ও রাঁধুনী পাগল জাতের ধান। সম্ভবত শেষোক্ত ধানের চাল রান্না করতে গিয়ে রাঁধুনির পাগল হবার জোগাড় হয়ে যেত এ রকম এমন নামকরণ।

ঢাকা: জেমস টেলরের মতে ঢাকা জেলায় প্রায় পাঁচ ধরনের ধান উৎপন্ন হতো যেমন-বুনা আমন, চোইনা বা দীঘা, আউশ, বোরো ও শাইল। প্রতি বিঘা জমিতে ১৬ মণ আমন ধান উৎপন্ন হতো। বুনা ধান অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে চাষাবাদ করা হতো তবে এর ফলন আমন ধানের তুলনায় কম। আউশ ধান উঁচু জমিতে চাষ করা হয় আর ময়মনসিংহ অঞ্চলে হয় বোরো ধান।[১৫]

মালদহ: উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেছেন যে, মালদহ জেলায় ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি, এমনকি জমিদার পক্ষও এ বিষয়ে কোনো সহযোগিতা করেনি। ধানের মতো অন্য ফসল এতো ব্যাপক জায়গা জুড়ে চাষাবাদ করা হতো না। যেমন শেরশাহবাদ পরগণার বেশির ভাগ জেলায় আগে যেখানে জঙ্গল ছিল এখন সেখানে ধান উৎপাদন করা হচ্ছে। এভাবে জঙ্গল পরিস্কার করে ধান আবাদের ঘটনা বাংলার অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও ঘটেছে।[১৬]

রংপুর: এ জেলার প্রধান শস্যই ছিল ধান। এখানে প্রধানত- আউশ ও আমন ধরণের ধান চাষ হতো। বুকানন হ্যামিল্টন উল্লেখ করেছেন যে, প্রতি বিঘা জমিতে গড়ে ৫-৭ মন ধান উৎপাদন হতো এবং এই পরিমাণ ধান থেকে ৩.৫ থেকে ৪ মণ চাল পাওয়া যেত। কৃষকরা আউশ ধান রেখে দিত নিজেদের ব্যবহারের জন্য আর আমন ধান দিয়ে খাজনা এবং অন্যান্য খরচাদি মেটাতো। মালদহের ন্যায় রংপুরে জমির পরিমাণ বাড়লেও জমির গুণগত মান বৃদ্ধি হয়নি।[১৭]

দিনাজপুর: মালদহ ও রংপুরের মতো দিনাজপুর জেলার প্রধান শস্য ধান হলেও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও জমির মান বাড়ানো হয়নি।[১৮]

ধান চাষের বিস্তৃতির ভিত্তিতে উৎপাদনের হার অনেকাংশে নির্ভরশীল। উনিশ শতকে এসে দ্রুত ফসলি জমি সম্প্রসারিত হতে দেখা যায়; এই শতকে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরেন্দ্রভূমি, সুন্দরবন ও উত্তর-পূর্ব বাংলার হাওর অঞ্চল চাষাবাদের আওতায় আসে।

১৮৯০ এর দিকে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি নথিতে কোন ফসল কী পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে তার বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলার পশ্চিম অংশে আবাদি জমির পরিমাণ না বাড়লেও পূর্ববঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধির খবর পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধির হার এতটাই নগণ্য ছিল যে তা সহজে চোখে পড়ে না। পাটের আবাদের জন্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ধান চাষের ক্ষেত্রে তাই ছিল।[১৯]

সামাজিক অবস্থান এবং ধান-চাল: ১৮৪৬ সালে *ক্যালকাটা রিভিউতে* প্রকাশিত 'দি জমিদার অ্যান্ড দি রায়ত' প্রবন্ধে ধান চালের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকের অবস্থা ফুটে উঠে। এর কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

> বাংলার যে কোনো স্থানেই যাই না কেন, চোখে পড়বে সেই একই দৃশ্য। রায়তের খাদ্যের মধ্যে শুধু ভাত আর কাপড়ের মধ্যে শুধু একটি নেংটি। তার শ্রম থেকে যা-কিছুই উৎপন্ন হয় তা উধাও হয়ে যায় নিমিষের মধ্যে। তার উপর পাওনা দাবি অনন্ত। সব দাবিই একে একে তাকে মেটাতে হয়। বাধ্য হয়ে তাকে দ্বারস্থ হতে হয় মহাজনের কাছে। তার রক্ত শোষণ করে ফুলে ফেঁপে উঠে মহাজন। বাংলার মাটি উর্বরতার জন্য খ্যাত। বীজ ফেললেই ফসল। প্রকৃতির এ বদান্যে রায়তের যদি স্বাধীনতা থাকতো, শোষণ থেকে নিরাপত্তা থাকতো, তবে দেশে সুখ-শান্তি-আনন্দের আর অবধি থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে কি? রায়তের জীবনে আছে শুধু অভাব, দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা। তাদের দুঃখ, তাদের কান্না, তাদের আর্তনাদ কারো মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে না, জাগায় না কোনো মায়া-মমতা। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকতে হলে একজনের জন্য মাসিক খরচ পড়ে দেড় থেকে তিন টাকা। পরিবারের সদস্যানুপাতে খরচও বেশি। আমাদের অনুমান, বাংলার কোনো জেলার একশত জনের মধ্যে পাঁচ জনেরও বাৎসরিক আয় একশত টাকার অধিক হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো

> রায়তের একক আয় দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। উপোষ এড়ানোর জন্য তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সবাইকেই কাজ করতে হয়। সে খায় শুধু মোটা ভাত আর সামান্য ডাল। শাকসবজি মাছ তার জন্য বিলাস। তার পোশাক হচ্ছে একটি নেংটির উপর বড় জোর একটি গামছা। শোয়ার জন্য আছে মোটা চাটাই ও বালিশ। নল-খাগড়া-শনের তৈরি কুঁড়ে ঘরটি তার আবাস। একটি লাঙ্গল, দুটি হালের গরু, একটি বা একাধিক মাটির লোটা ও কিছু বীজ ধানই তার সম্পদ। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কাজ করে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, কিন্তু তাতেও তার দারিদ্র্য ঘুচে না, বুকে তার পাঁজর দেখা যায়। এমনকি স্বাভাবিক সময়েও রায়তকে বছরের অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়। অত্যাচারে, অভাবে, অসহায় অবস্থায় রায়ত হারিয়েছে তার বিবেকবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, মানবিক মূল্যবোধ। দেহ ও মনে সে এখন পশুর তুল্য।[২০]

ক্যালকাটা রিভিউ-এর বক্তব্য বাংলার ধান চাষী কৃষকের করুণ ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পূর্ববঙ্গে শতকরা কত ভাগ মানুষ কৃষক ছিল তা ১৮৮১ সালের পরিসংখ্যান থেকে বেশ স্পষ্ট হয়। রাজশাহীর মোট জনসংখ্যার ৬৮.৫৬ শতাংশ, চট্টগ্রামের ৬৬.৫৩ শতাংশ এবং ঢাকা জেলায় ৫৫.৩০ শতাংশ মানুষ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২১] পরিসংখ্যানগত চিত্রে স্পষ্ট যে, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল কৃষক। তারা চরম অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করত।

এই দুঃখ দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আকবর আলী খান লিখেন, বাংলার গ্রামগুলো ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলে তাদের পক্ষে সয়ংম্বর হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।[২২] গ্রামীণ বাংলার সমাজ অর্থনৈতিকভাবে যেহেতু স্বাধীন ছিল না তাই তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল ছিল। গরিব কৃষক, অবস্থাপন্ন কৃষক, জোতদার, জমিদারদের উপর নির্ভরশীল। সেই নির্ভরশীলতার সুযোগে ঋণদাতাগোষ্ঠী সর্বোচ্চ ফায়দা লুটেছে।

উনিশ শতকের গ্রামীণ কাঠামোয় ছোট ছোট কৃষক পরিবারের নিজস্ব কোনো জমিজমা ছিল না এবং তারা অনেকেই বর্গাচাষী হিসেবে অন্যের জমিজমা চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করত। বর্গাচাষী জমিতে যে ফসল চাষ করবে তার একটি অংশ বর্গাদারকে ভাগ দিতে হতো। উল্লেখ্য, বর্গাদার ও বর্গাচাষীর মধ্যে সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্কটি অনেকটা জমিদার ও প্রজার মতোই। জমিদার, জোতদার ও বর্গাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বিশ শতকে উত্তর বাংলায় 'আধিয়ার আন্দোলন' হয়েছিল তা উৎপন্ন ফসলের অংশীদারিত্ব নির্ধারনের জন্যই। বড় বড় কৃষকেরা স্থানীয় লোকজনের মধ্যে চাহিদা মাফিক চুক্তিভিত্তিক জমি প্রদান করতো। এক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের অংশই ছিল তাদের প্রাপ্যতা। যেহেতু জমিতে ধান চাষ করা হতো তাই জোতদারকে তার প্রাপ্যতা পরিশোধও করা হতো ধান দিয়েই।

এদেশের মানুষ মেয়ে বা বোনের বিয়ে দিত ভাত দেখে। যে ঘরে ভাতের অভাব নেই সেখানে সবাই আত্মীয়তা করতে আগ্রহী ছিল। এটাকে সম্ভবত গ্রামীণ ভাত কূটনীতিও বলা যেতে পারে। দুর্দিনে যেন দুই দানা ধান-চাল সাহায্য পাওয়া যায় সেই ভরসায় বাঙালি সমাজ অবস্থাপন্ন ধানী ধনীদের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিত। তাদের মাথায় হয়ত এরকম চিন্তা হত যে অন্তত তাদের মেয়েটা যাতে ভাতের অভাবে কষ্ট না পায়।

বাংলা অভিধানে 'ভাতার' বলে একটি শব্দ আছে যার মানে 'ভাত দেয় যে'।[২৩] যার ভাত আছে তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা একটি দুস্থ অভাবী সমাজের লক্ষণ নয় কি? এটা খুব সাধারণ যৌক্তিক অনুধাবন।

বর্তমানেও এই প্রবণতা দেখা যায় যে, আর্থিকভাবে সামর্থবান ব্যক্তিরা বেশি সরু ও সুগন্ধি চালের ভাত খান এবং মিহি কাপড় পরিধান করে থাকেন। অন্যদিকে অসচ্ছল গরিব বলতে মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের মানুষকেই বোঝানো হয়ে থাকে। একুশ শতকীয় অভিজ্ঞতায় এটা সহজে অনুমেয় যে, উনিশ শতকের বাংলার গ্রামীণ সমাজে অনুরূপ ধারণা কতটা প্রবল ছিল। যারা সুগন্ধি চালের ভাত খেতেন তারা গ্রামীণ কৃষক সমাজের চেয়ে উন্নত জীবন যাপন করতেন এবং সংখ্যায় তারা ছিলেন অল্পকতেক।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণে ধান-চাল: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে জমির মালিক হন জমিদার এবং কৃষক জমিদারের প্রজায় পরিণত হয়। এই সময় রাজস্ব আদায় হতো নগদ অর্থে। এর ফলে অল্পদিনেই বাংলার গ্রাম সমাজের কাঠামোতে নড়বড়ে অবস্থা সৃষ্টি হয়। কৃষক মুদ্রার প্রয়োজনে অন্যের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে উদ্ভব ঘটে মহাজনি ব্যবস্থার। এদিকে জমিদার পাওনা আদায়ের জন্য নানারকম মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করে রায়তকে নিজের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।

উনিশ শতকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটার ফলে পণ্য পরিবহন অনেক সহজ হয়ে যায়। এর প্রভাবে কৃষি পণ্যের বাজার স্ফীত হয়। কৃষকের প্রবণতা হলো অধিক মুনাফা হবে এমন ফসল উৎপাদন। বাংলার চাষিরাও অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রির আশায় ধানের বদলে ডাল চাষ শুরু করে।

১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধ এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬২) কারণে ভারত থেকে পাট, তেলবীজ ও তুলার আমদানি চাহিদা বেড়ে যায়। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত করে দেয়ার ফলে ভারতের সাথে ইউরোপের দুরত্ব কমে যায় এবং ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে সেখানে শিল্প কারখানায় কাঁচামালের চাহিদা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার কৃষির উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করে। রতন লাল চক্রবর্তী এই প্রবণতাকে বাংলার 'কৃষি উন্নয়নের হাতিয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৪]

বাজারের চাহিদা কৃষির জন্য আনুকূল্য বয়ে আনলেও ধান চাষের জন্য তা কল্যাণকর ছিল না। চাহিদা-যোগান বিধি মোতাবেক একটি পণ্যের চাহিদা বাড়লে তার যোগান বেড়ে যায়। এটি হলে সঙ্গত কারণেই খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাবে। বাংলার কৃষক কৃষি পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের ফাঁদে পা দিয়ে খাদ্য শস্য উৎপাদন না করে অর্থকরী ফসলের দিকে ঝুঁকে পড়ে পাট, চা, তুলা, আফিম চাষ আরম্ভ করে। এ কারণে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হয়। ধান উৎপাদনের প্রতি কোম্পানি সরকারের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৪৫-৪৬ সালের দিকে আফিম উৎপাদনের প্রতি এতটাই গুরুত্ব দেয় যে গোটা ভারতে এর উৎপাদন ২২% বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাট চাষের পরিসর বৃদ্ধি পায়। হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটকল স্থাপিত হওয়ায় কাঁচা পাটের চাহিদা বাড়তে থাকে বিধায় পাটের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তবে প্রকৃতি যেন অপেক্ষায় ছিল প্রতিশোধের। ১৮৭০-এর দশকে বিহারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বাংলাতেও চালের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পায়[২৫] এবং বাংলার চাষি প্রয়োজনের তাগিদে আবার ধান চাষে মনোনিবেশ করে।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েন বাংলার কৃষকের চিরদিনের। ধার-দেনা করে তাদের চলতে হয়। দাদন নিতে হয়। যেমন উনিশ শতকে এসে নীল চাষের জন্য দাদন নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কৃষি ঋণের ইতিহাস বহু পুরনো। উল্লেখ্য, পূর্বে আমরা *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি যে, রাজা প্রজাদের মাঝে ঋণ হিসেবে ধান বিতরণ করছেন দুর্ভিক্ষের সময়ও ঋণ হিসেবে ধানই ছিল বাঁচানোর উপায়। প্রকৃতি নির্ভর হবার কারণে প্রাকৃতিক দুযোর্গ যেমন বন্যা-খরা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টিতে ধান ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেলে ঋণ না নিয়ে কৃষকের আর কোনো উপায় ছিল না। বিশ শতকের শেষ দিকেও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ঋণ হিসেবে ধানই দেয়া হতো। দুর্দিনে একমণ ধান নিলে ফসল উঠলে দেড় মণ ধান পরিশোধ করতে হতো। এটি সহজে অনুমেয় যে, বিশ শতকের জ্ঞানদ্বীপ্ত সমাজের এই অবস্থা হলে উনিশ শতকের পরাধীন সমাজে তা কেমন ছিল।

১৮৮৮ সালের ডাফরিন রিপোর্টে ১০০ টি গ্রামের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায় এদেশের গড়পরতা মানুষের খাবারের অভাবে আছে এবং উনিশ শতকের গ্রামীণ সমাজের ২৬ শতাংশ মানুষের প্রধান পেশাই ছিল দিন মজুরের কাজ করা।[২৬]

দিন মজুর, ঋতু ভিত্তিক মজুর এমনি বার্ষিক মজুরকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া হতো ধান-চাল। প্রদেয় পারিশ্রমিক অঞ্চলভেদে পৃথক ছিল; যেমন বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় পূর্ব বাংলায় এটা ছিল বেশি। গড়ে দৈনিক কাজের বিনিময়ে ২ সের চাল দেয়া হতো একজন

মজুরকে। মজার বিষয় হলো- বাংলার মজুরকে যে পরিমাণ মজুরি দেয়া হতো সেটাকে ডাফরিন রিপোর্টে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বলেছেন।[২৭]

শ্রমিকের মজুরি কিংবা কৃষকের জীবনের পাশাপাশি বাংলার শিক্ষার ইতিহাসের সাথেও জড়িয়ে আছে ধান-চাল। উনিশ শতকে যে সব বেসরকারি মক্তব, মাদ্রাসা, পাঠশালা, টোল কিংবা আশ্রম ছিল সেখানে শিক্ষককে পাঠদানের পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ অর্থের পাশাপাশি ধান-চাল দেওয়া হতো। ধান (ফসল) উঠলে তার একটি অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, মেরামত এবং শিক্ষকের বেতন পরিশোধে ব্যবহৃত হতো। 'মুষ্টির চাল'[২৮] প্রথা আজও বাংলাদেশের এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অনেকস্থানে টিকে আছে।

গ্রাম বাংলায় 'ফেরিওয়ালার অর্থনীতি'[২৯] বলে একটি বিষয় আছে। গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই এর সাথে জড়িত হলেও নারীরাই এর সাথে অধিকসম্পৃক্ত। গ্রামের রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা 'নিবেন নিবেন' বলে চিৎকার করলে নারীরা বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় অথবা শখের দ্রব্যাদি ধান-চালের বিনিময়ে ক্রয় করে।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূণ চালিকা শক্তি হলো গবাদি পশু-পাখি অর্থাৎ গরু-ছাগল, মহিষ, হাঁস-মুরগি। বিশেষত গরুর ব্যবহার বাঙালি কৃষক জীবনে অপরিহার্য এবং ধান-চাল থেকে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে প্রাপ্ত খড় গরুর খাবার এবং ঘরের চালে ছাউনি হিসেবে অদ্যাবধি ব্যবহার হয়ে আসছে। ধান-চাল থেকে প্রাপ্ত তুষ, রান্না করা ভাতের ফেন এবং বাসি ভাত গরুকে মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধান থেকে চাল করতে গিয়ে প্রাপ্ত খুদ এদেশের গবাদি পশুর খাদ্য। গরুর পাশাপাশি মহিষ, ছাগল, হাঁস-মুরগি এসব খুদ, ফেন বা খড় খেয়ে টিকে থাকে।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ধান-চালের ভূমিকা: ধান যে শুধু ভাতের জন্য ব্যবহার হতো তা কিন্তু নয়। বাংলার পূজা-পার্বণ, উৎসবগুলোর দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে এই অনুষ্ঠানাদিতে ধান-চাল পুজার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। উৎসব হিসেবে 'নবান্ন' অতি পরিচিত। অঘ্রাণ মাসে যখন নতুন ধান হয় বাংলার কৃষক পরিবারগুলো তখন উৎসবে মেতে উঠত। নতুন ধানের চাল দিয়ে নানা রকম পিঠা-পুলি, ক্ষীর-পায়েস বানিয়ে বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন করা হত। এখনো গ্রাম বাংলার অনেক জায়গায় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে বর-কনেকে ধান-চাল দিয়ে আর্শীবাদ করা হয়। এর কারণ হলো যাতে দম্পতি অন্নাভাবে দিনাতিপাত না করে। বাঙালি হিন্দু সমাজে নতুন শিশুর মুখে খাবার তুলে দেয়ার একটা অনুষ্ঠানের নাম 'অন্নপ্রাশন'।

কৃষ্ণরাম দাস রচিত *কমলামঙ্গল* কাব্যে তিনি দেবী লক্ষ্মীর জন্য ধানকে আবরণ ও আভরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। "কোনটি দেবীর পায়ের আলতা, কোনটি পাসুলি, কোনটি আবার গলার হার কিংবা সাতনরী হার। দেবীর চুলের অলঙ্কার, সিঁথি থেকে পায়ের নুপুর সবখানেই ধানের অপরূপ ব্যবহার।"[৩০]

বাংলার রন্ধনশিল্পের বিরাট একটা অংশ জুড়ে রান্নার উপাদান ধান-চাল। ধান থেকে খৈ আর চাল থেকে ভাত, মুড়ি, মুড়কি, মোয়া, নাড়ু, চাল ভাজা, পিঠা-পায়েস, পান্তা ভাত অর্থনৈতিক অবস্থা ভেদে পলান্ন তৈরি হতো এই শতকে। উল্লেখ্য যে, ভাত থেকে মদ তৈরি হতো বলে উল্লেখ করেছেন নীহাররঞ্জন রায়।[৩১]

ধান-চাল সংরক্ষণের জন্য নানা রকম ধানের গোলা, মটকা তৈরি হতো; কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাদির সাথে ধানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

ধান-চালের বিবিধ ব্যবহার: বাংলা অঞ্চলে যখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না তখন মানুষ চিকিৎসার জন্য গ্রামের কবিরাজের ওপর নির্ভর করত। কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে গ্রামীন কবিরাজ চিকিৎসার ঔষুধ-পথ্য হিসেবে এক ধরণের চালের ভাত খাওয়ার কথা বাতলে দিতেন। এই চালের নাম 'কবিরাজশাল'।[৩২] শুধু তাই নয় পেটের অসুখ হলে এখনও 'জাউ'[৩৩] খাওয়ার কথা বলা হয়।

উপসংহার: প্রাচীনকাল থেকে বাংলা কৃষি প্রধান অঞ্চল বলে সুবিদিত। কৃষি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে এলাকার সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। উনিশ শতকে এসে ধান চাষ কিছু কিছু অঞ্চলে কমেছে এবং কৃষকের অন্যান্য ফসল চাষাবাদে বেশি আগ্রহী হওয়ার কারণে গ্রামের মানুষের ভাতের অভাব থেকে যায়। জমিদার-জোতদার ও তাদের রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধিবর্গের শোষণ ও কৃষিঋণে গ্রাম বাংলার কৃষক শ্রেণি অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায়। একই জমিতে বছরের পর বছর চাষাবাদ, উন্নত চাষাবাদের পদ্ধতির অভাবে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে ধানী জমি পরিণত হয়েছে নীল, তামাক ও পাটের মতো ফসলের জমিতে। এতো কিছুর পরেও এদেশে উনিশ শতকেও ধান-চালের প্রয়োজনীয়তা বিন্দু মাত্র কমেনি কারণ বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত; ভাত ছাড়া বাঙালি বাঁচে না। উনিশ শতকে খাবারের পাশাপাশি ধান-চাল কেন্দ্রিক অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল। ধান-চালের উপর গৃহপালিত গবাদি পশুও নির্ভরশীল ছিল। মানুষ অর্থনৈতিক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ধান-চালের ব্যবহার করে এসেছে। এমনকি একুশ শতকের বিট কয়েনের যুগে এসেও এদেশের

গ্রাম বাংলার মা-বোনেরা নগদ অর্থ ছাড়াই ধান-চাল দিয়ে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তাদের টুকটাক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (বাংলা বাজার, ঢাকা: বুক ক্লাব প্রকাশনী, ২০১৫), ৯

২. 'কৃষি ইতিহাস', *বাংলাপিডিয়া*, সম্পা. ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF

৩. মো. শাহীনুর রশীদ, 'বাংলার কৃষকের প্রযুক্তি-চর্চা: প্রসঙ্গ ভূমি-কর্ষণ,' *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খণ্ড ৪০ (গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/ জুন ২০২২), ১-২০

৪. Te-Tzu Chang and A.H. Bunting "The rice cultures," The International Rice Research Institute, vol.275, (Manila, Philippines: Royal Society, 1976), 143-175, https://www.jstor.org/stable/2418218

৫. মিজানুর রহমান, 'মধ্যযুগীয় কৃষি: প্রত্ন-উদ্ভিদ সমীক্ষা,' *বাংলাদেশের ইতিহাস সুলতানি ও মোগল যুগ*, *খণ্ড ২*, সম্পা. আবদুল মমিন চৌধুরী (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০২০), ৭৯

৬. *The Yajur Veda*, Chapter 18, Varse-10, Trans. Devi Chand, M.A. (Hoshiarpur, Punjab: India, V.V.R.I. Press, 1959), 192 https://ia802901.us.archive.org/33/items/yajurveda029670mbp/yajurveda029670mbp.pdf

৭. Te-Tzu Chang and A.H. Bunting "The Rice Cultures," The International Rice Research Institute, Vol. 275, (Manila, Philippines: Royal Society, 1976), 143-175, https://www.jstor.org/stable/2418218

৮. Anupam Paul "Folk Rice Biodiversity: Cultivation and Culture," Department of Biotechnology, Viswa-Bharai University and PSB Santineketan, (West Bengal: India, 2014) *https://www.academia.edu/9022604/Folk_Rice_Biodiversity_Cultivation_and_Culture?email_work_card=view-paper*

৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬), ১৩৮

১০. *প্রাগুক্ত*, ১৩৮

১১. ইমতিয়াজ হায়দার, *ইস্ট ইন্ডিয়া আমলে ঢাকা* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১৯), ১০২

১২. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রাচীন যুগ* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০২০), ১৯৭

১৩. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের বাংলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭১), ১৭৪-১৭৫

১৪. *প্রাগুক্ত*, ৮৫

১৫. ইমতিয়াজ হায়দার, *প্রাগুক্ত*, ১০১-১০২

১৬. W.W. Hunter, *A Statical Account of Bengal* vol. 7 (London: Trubner & Co., 1876), ৭০-৭১

১৭. *প্রাগুক্ত*, ২৩৮

১৮. *প্রাগুক্ত*, ৩৯০

১৯. 'কৃষি', *বাংলাপিডিয়া*, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF

২০. মিলটন কুমার দেব ও মো. মনিরুজ্জামান, *প্রতিরোধ আন্দোলন ও নিম্নবর্গের ইতিহাস* (বাংলা বাজার, ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১৭), ৩৭

২১. প্রাগুক্ত, ৩৭

২২. আকবর আলি খান, *বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২০), ৯৩

২৩. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিরী (সম্পা.) *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৯২৪

২৪. Ratan Lal Chakraborty, "Policy and Programmes of Rural Development in Bangladesh During the Colonial Rule," in *Socio-Ecnomic History of Bangladesh Essays in Memory of Professor Shafiqur Rahman* ed., by M. Mufakharul Islam, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2004), 39

২৫. David Hall-Mathews, 'Historical Roots of Famine Relief Paradigms: Ideas on Dependency and Free Trade in India in the 1870s,' *Disasters* vol.20, (St Antony'a College: Oxford, 1996)

২৬. Wiillem Van Schendal, 'Economy of Working Class,' in *History of Bangladesh 1704-1971 Economic History*, ed., Sirajul Islam (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2017), ৫৩৫

২৭. *প্রাগুক্ত*, ৫৩৮

২৮. একটি নির্দিষ্ট লোকালয়ে বসবাসরত মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এক মুঠ করে চাল উত্তোলন করা হয়।

২৯. ফেরিওয়ালার অর্থনীতি বলতে একজন ফেরিওয়ালার সাথে উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বেচাকেনাকে বোঝানো হয়েছে।

৩০. মনাঞ্জলি বন্দোপাধ্যায়, 'ধান বৈচিত্র্যঃ বাংলার কৃষি কৃষ্টির এক অধ্যায়,' *বিশ্বকোষ পরিষদ পত্রিকা* (৩য় বর্ষ ১৯ আশ্বিন, ১৪১৮) https://www.academia.edu/1962889/Rice_Diversity_of_Bengal_and_Bangladesh

৩১. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, ৪৪৭-৪৪৮

৩২. Anupam Paul 'Folk Rice Biodiversity: Cultivation and Culture,' Department of Biotechnology, Viswa-Bharai University and PSB Santineketan, (West Bengal: India, 2014) *https://www.academia.edu/9022604/Folk_Rice_Biodiversity_Cultivation_and_Culture?email_work_card=view-paper*

৩৩. জাউ হলো ভাতের এক ধরনের পদ। ভাতকে নরম করে রান্না করা হয়।